গ্রন্থ পর্যালোচনা

বিপিনের সংসার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

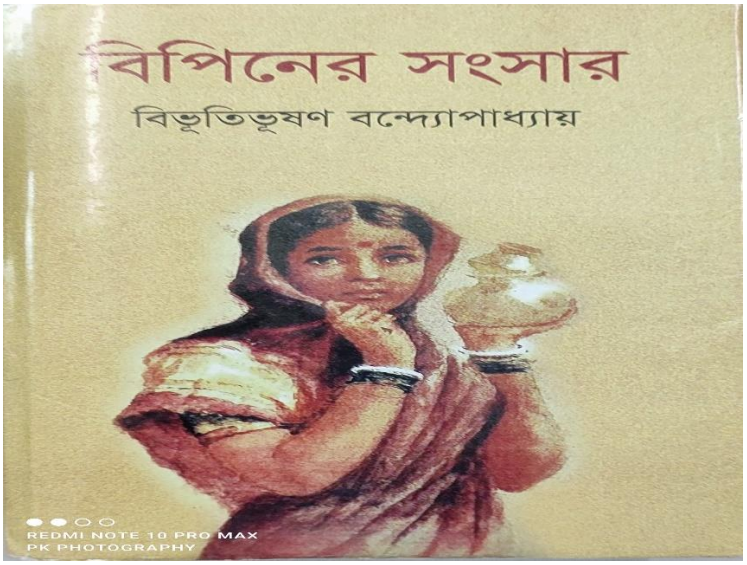

পর্যালোচনায়ঃ

পংকজ দাশ

রোল নং-২৮

২২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্রকক্সবাজার,

পুস্তক পরিচিতি

বিপিনের সংসার

লেখক	:	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধরণ	:	সামাজিক উপন্যাস
প্রথম বিভাস সংস্করণ	:	জুলাই ২০১৮
প্রকাশক	:	রামশংকর দেবনাথ, বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড (রুমী মার্কেট), দোকান-১০,বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
প্রচ্ছদ	:	অনিরুদ্ধ পলল
পৃষ্ঠা সংখ্যা	:	১৬০
মূল্য	:	২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।
ISBN	:	৯৮৪-৭০৩৪৩-০৬০৩-৩

লেখক পরিচিতি

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫০- ১৮৯৪) প্রথিতযশা বাঙালি লেখক। তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি প্রায় ২০টি গল্পগ্রন্থ, কয়েকটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি এবং দিনলিপিও রচনা করেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার মরণোত্তর)'পথের পাঁচালী' এটি হল বিভূতিভূষণের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা।

জন্ম	১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪
	মুরাতিপুর গ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা, বাংলা প্রদেশ(এখন পশ্চিমবঙ্গ), ভারত
মৃত্যু	১ নভেম্বর ১৯৫০ (বয়স ৫৬)
	ঘাটশিলা, বিহার (এখন ঝাড়খণ্ড), ভারত
জাতীয়তা	বাঙালি
নাগরিকত্ব	ভারত
ধরন	উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণসাহিত্য, দিনলিপি
উল্লেখযোগ্য	পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, *ইছামতী, অশনি*
রচনাবলি	*সংকেত, মেঘমল্লার, তালনবমী, চাঁদের পাহাড়, দৃষ্টিপ্রদীপ,দেবযান*
উল্লেখযোগ্য	রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর, ১৯৫১)
পুরস্কার	
দাম্পত্যসঙ্গী	গৌরী দেবী (১৯১৭-১৮)
	রমা দেবী (১৯৪০-৫০)

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এর সাথে 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' একটি সামাজিক উপন্যাস। এর প্রকাশকাল ১৯৪০। ইংরেজ সময়ের পটভূমিতে এ উপন্যাসে লেখক তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের একজন 'রাঁধুনী বামুন', হাজারি ঠাকুরের জীবনকথা সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে ইংরেজ আমলের একজন বিপিন নামক ব্রাহ্মণের জীবনকথা বলা হয়েছে। বিভূতিভূষণ আমাদের পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর গাছপালা, ফলমূল, ধূলোমাটির উপকরণ নিয়ে আপন চৈতন্যের অলৌকিক শক্তি মাধুর্য্য মণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যলোক। সারল্য ছিল তাঁর রচনার সাধারণ শৈলী। তাই প্রেয়সী নারীর প্রেমও তাঁর রচনায় প্রাকৃতিক পুষ্প-পত্রের মতই সহজ ও স্বয়ংপুষ্ট। আবার তিনি ছিলেন কল্লোল যুগের আঙ্গীক সচেতন, জীবন জটিলতায় ভারাক্রান্ত এক আনমনা পথিক। তিনি স্বপ্নলোকের ভারহীন স্বাদ আর অধরা সুরভিতে সমগ্র চেতনাকে খুশিতে ভরে বিদায় নিয়েছেন। আর তাই তিনি বিশ শতকীয় জীবনের পঙ্কপল্বলে মানব সরোবরের শিল্পদূত।

প্রারম্ভিক কথা

বিভূতিভূষণের 'বিপিনের সংসার'(প্রকাশকাল-১৯৪১) উপন্যাসটি অতি সমাধৃত একটি সামাজিক উপন্যাস। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্ধ সমাজ ব্যবস্থার কুফল, বর্ণবাদের প্রবাল থাবা, জমিদার কর্তৃক প্রজাদের নির্যাতন, নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা, পরকীয়া প্রেমের করুণ পরিণতি, সংসার জীবনের বাস্তব কাহিনী ইত্যাদি।

ব্রিটিশ ভারতের একটি বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতিনিধি বিপিনের জীবনের উত্থান পতনকে অবলম্বন করে রচিত এই উপন্যাসটি বর্তমান একবিংশ শতকে এসেও প্রাসঙ্গিক। এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ ভারত এর ইংরেজ শাসন আমলের শেষ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ এর গ্রামীণ পটভূমিতে। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলা করেছেন লেখক। মানবচরিত্রে প্রেম, ভালোলাগা, কর্তব্য, বেদনা, ত্যাগের মত জিনিসগুলোই তুলে নিয়ে এসেছেন সূক্ষ্মতার সাথে। স্বভাবতই বিভূতিভূষণের অন্যান্য লেখার মতই প্রান্জল এই লেখাটিও। পড়তে পড়তে ঠিক চোখের সামনে সেই পুরনো দিনের গ্রামবাংলা ভেসে ওঠে, সেই সাথে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রও বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। গভীর সব কথোপকথন, মান- অভিমান আর গভীর সুখ ও দুঃখের মতো জটিল সব বিষয় গুলো বইটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। বিপিনের জীবনের ব্যবচ্ছেদে লেখক পাঠককে নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বিপিনের প্রেম, ভালোবাসা, মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম, উদারতা, জমিদারি প্রথার কুফল সবকিছু মিলে উপন্যাসটি পাঠককে আকর্ষণ করবে। জমিদারির নামে গরীবদের নির্যাতন , অবৈধ ভালোবাসা বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, সংসারের টানাপোড়েন বিষয়গুলো সমসাময়িক । বিপিন ও মানীর প্রেম, বিনোদ চাতুজ্জে ও কামিনীর মধ্যে প্রেম , বিধবা বীণা ও পটলের মধ্যে প্রেম এইসব কিছুই একজন পাঠককে রোমাঞ্চিত করবে। সোনাতনপুরে ডাক্তারি করতে গিয়ে শান্তির সাথে বিপিনের অন্যরকম ভালোবাসা , উঁচু বংশের বিশ্বেশ্বর ও নিচু বংশের মতি বাগদীর মধ্যে অমর প্রেম কাহিনী এবং পরিশেষে মতির মৃত্যুতে বিপিন ও বিশ্বেশ্বরের হৃদয়ক্ষরণ তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের প্রেম, ভালোবাসার মিথস্ক্রিয়া, জাত-পাতের বৈষম্য, ধর্ম ভীরুতা, মানব মনের রসায়নকে বিশেষায়িত করে।

উল্লেখযোগ্য চরিত্র পর্যালোচনা

- বিপিনঃ বিপিন জাতিতে ব্রাহ্মণ । এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করে পুরো উপন্যাসটি চালিত হয়েছে। সে জমিদারের বাড়িতে নায়েবের চাকরি করে। বিপিনের বয়স সাতাশ কি আটাশ। মনোরমাকে বিয়ে করলেও জমিদারের মেয়ে মানীর প্রতি তার অন্যরকম ভালোবাসা এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।
- মানীঃ এই উপন্যাসের নায়িকা। জমিদারের সুশ্রী শিক্ষিত কন্যা। প্রকৃত নাম সুলতা। বয়স বাইশ বছর। তার বিয়ে হয় একজন ধনশালী উকিলের সাথে। বিপিনের খেলার সাথী ছিল। বিপিনের প্রতি তার যত্নশীলতা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।
- শান্তিঃ পিপলি পাড়ার রামনিধি দত্তের মেয়ে শান্তি। যদিও সে বিবাহিত তথাপি বিপিনের প্রতি তার যে ভালোবাসা ও যত্নশীলতা সেসব কিছু বিপিনকে তাকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে।
- মনোরমাঃ বিপিনের স্ত্রী মনোরমা খুবই সংসারী নারী। তার বাবা অর্থশালী ছিল। বিনোদ চাটুজ্জের অর্থবিত্ত দেখে তাকে তার কাকা বিপিনের সাথে বিয়ে দেন।সংসারের নানা অভাব অনটনের মাঝেও সবাইকে নিয়ে একসাথে আছে। যদিও সে বিপিনের মন জয় করতে পারি নি।
- বীণাঃ বিপিনের বিধবা বোন। পটলের সাথে তার পরকীয়া প্রেম রয়েছে। সে বিপিনকে গরু কেনার জন্য গলার হার আর দোকান দেওয়ার জন্য নগদ দেড়শত টাকা দিয়েছিল যা তার একমাত্র সম্বল ছিল। পটলের সাথে তার প্রেমের কথা গ্রামের সকলের মুখে মুখে।
- পটলঃ তারক চাটুজ্জের বিবাহিত ছেলে পটলের চার/পাঁচ জন সন্তান থাকা সত্ত্বেও বিপিনের বিধবা বোন বীণার সাথে নানান ছুতোয় মিলামিশা করে।
- কামিনী পিসীঃ বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সাথে তার পরকীয়া প্রেম ছিল। সে ছিল বিধবা। বিপিনকে অত্যন্ত স্নেহ করত। মাঝে মাঝে তাকে খাবার এনে দিত। তার মৃত্যুকালে বিপিন তার পাশে ছিল।
- জমিদার অনাদি চৌধুরীঃ পলাশপুরের জমিদার। অত্যন্ত লোভী। বিপিনকে দিয়ে খাজনা আদায় করে তার পরিবার চলত।
- বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীঃ মাইনর স্কুলের ২য় পন্ডিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিচু জাতের মতি বাগদীর সাথে তার পবিত্র প্রেম এবং সমাজ ও চাকরিকে ছেড়ে আসা পাঠককে প্রশান্তি দিবে।
- বলাইঃ বিপিনের স্নেহের ছোটভাই। নেফ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত ছিল সে। অত্যন্ত পরিশ্রমী বলাই ছোট বড় সব কাজই করত। তার মধ্যে জাত যাবে এই ভয় ছিল না। রাণাঘাট হাসপাতালে অনেকদিন সে ভর্তি ছিল। বলাইয়ের মৃত্যু পাঠকদের অশ্রু বিসর্জনে বাধ্য করবে।

কাহিনী সংক্ষেপ

বিপিনের হলো বিনোদ চাটুজ্জের ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। ব্রাহ্মণ হলেও তার জীবন ধারা ভালো ছিল না । বিনোদ চাটুজ্জের মৃত্যুর পর সে সব টাকা উড়িয়েছে। জমিজমা যা ছিল সব হারিয়েছে নারী সঙ্গ, নেশা, আড্ডায় আর হেলাফেলা করে। সংসারে নানা অভাব অনটনের মধ্যেও তার স্ত্রী মনোরমা সবকিছুই সামলে নিয়েছে। মাঝে মাঝে মনোরমাকে অনাহারে থাকলে হয়। কিন্তু বিপিন দায়িত্বজ্ঞানহীন। সংসারের কোন কিছুতেই তার মনোযোগ নেই। একটা মশারি কেনার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই তার। মনোরমা অভাবের কথা বললে বিপিন রেগে উঠে। পরিবারে রয়েছে তার বিধবা বোন বীণা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা আর অসুস্থ ভাই বলাই। মারা যাওয়ার আগে বিনোদ চাটুজ্জে পলাশপুরের জমিদার অনাদি চৌধুরীর নায়েব ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর বিপিন সেই নায়েবের চাকরিই নিল। কিন্তু তাতে তার সংসারই চলে না। ধোপাখালি থেক খাজনা আদায় করতে হয় তাকে। কিন্তু সে তার বাবার মত এতটা পারদর্শী নয়। সে তার বাবার মত প্রজাদের অত্যাচার করতে পারে না। জমিদারের একমাত্র মেয়ে মানীর সাথে তার ভাব রয়েছে। “যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘারের উপর অর্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত।” তার মানীর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে কিন্তু মনোরমার সাথে নয়। মানী সুশ্রী , সুন্দর করে কথা বলতে পারে। বিপিনকে অনেক খাতির যত্ন করে, যদিও মানী বিবাহিতা। তার জামাই বড় উকিল। জামাইয়ের এত টাকা-পয়সা থাকতেও সে বিপিনকে মনে মনে কামনা করে। কিসের যেন অপ্রাপ্তি তার মধ্যে রয়েছে। বিপিনও তাকে নিয়ে ভাবে কিন্তু বলতে পারে না। যখন মনোরমার সাথে বাসর হয় তখনও বিপিন মনোরমাকে মানী ভেবে কল্পনা করে। এভাবে চাকরির খাতিরে মানীর সাথে বিপিনের আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠে। মানী তার জন্য পোলাও রান্না করত। জানালার ধারে বসে থাকত বিপিনের সাথে কথা বলার জন্য। মানীর কথামত সে মানীর কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচন্দ্রের ‘দত্তা’ আর কিছু ডাক্তারি বই। ধোপাখালীতে যখন সে খাজনা আদায় করতে যায়, কামিনী পিসীর সাথে প্রায়ই দেখা হতো। কামিনী পিসীও বিপিনকে অনেক স্নেহ করত, মাঝে মাঝে খাবার এনে দিত। কামিনী পিসীর সাথে বিপিনের বাবার সে সম্পর্ক ছিল সেটা বিপিন জানত। বিপিনের সাথে দেখা হলেই কামিনী পিসী বিনোদের কথা বলতই। কামিনীর মৃত্যুর পাশে একমাত্র বিপিনই ছিল। পরবর্তীতে মানীর পরামর্শে বিপিন ডাক্তারি বই পড়ে রোগীদের সেবা দিবে বলে মনস্থির করে। কালক্রমে বলাইয়ের মৃত্যু হয়। বাণী আর পটলের প্রেমের কথা গ্রামে জানাজানি হয়ে যায়। সংসারে অভাব আর অভাব। সব মিলিয়ে বিপিন চোখে অন্ধকার দেখছে। পাশের গ্রামের আইনদ্দির সাথে বিপিনের আড্ডা হয় । আইনদ্দি শতবর্ষী। তার সাথে কথা বলতে বিপিনের ভালোই লাগে। সে রামায়ন, মহাভারত, সাহিত্য সব পড়েছে। মনোরমাকে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে বিপিন নায়েবের চাকরি ছেড়ে ডাক্তারি করার জন্য পিপলিপাড়া ও সোলতানপুর গমন করে। সেখানে রামনিধি দত্তের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমের দিকে দুই তিন মাস রোগীপত্তর না থাকলেও যদু ডাক্তারের সাথে একদিন ডাক্তারি প্রতিযোগিতায় হাতুড়ে চিকিৎসা করে এক মুহূর্ষু রোগীকে বাঁচালে চারদিকে বিপিনের নামডাক হয়ে যায়। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি জামাই সহ বাড়িতে আসলে বিপিনের সাথে শান্তির পরিচয় হয়। শান্তি মানীর মত সুন্দরী না হলেও শান্তির হাসিখুশি মাখা কথাবার্তা, খাতির যত্ন, গল্প করা বিপিনকে মোহিত করে।

শান্তিও বিপিনকে ভালোবেসে ফেলে যদিও বিপিন দ্বিতীয় ভুল করতে নারাজ। কিন্তু শান্তির আচরণ তাকে আবার ভাবতে বাধ্য করে। বিপিনের ভাষায় "মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না- যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়-সে-ই কেবল দেখিতে পায়।" যখন শান্তি শ্বশুরবাড়ি চলে যায় বিপিনের অনেক মন খারাপ হয়। এরপর সে বাড়ি আসতেই দেখে মনোরমাকে সাপে কামড়িয়েছে। মনোরমাকে সুস্থ করার পর তার প্রতি বিপিনের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে বিপিন শান্তির শ্বশুরকে নিয়ে রাণাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যান চোখের চিকিৎসার জন্য।তার সাথে শান্তি, জামাই গোপালও যায়। ডাক্তারের পরামর্শে তাদের সেখানে কয়েকদিন থাকতে হয়। শ্বশুরের অনুরোধে শান্তিকে নিয়ে টকি বায়োস্কোপ দেখতে যায় বিপিন আর শান্তি। শান্তি অনেক উপভোগ করে। এই নতুন শান্তিকে দেখে বিপিন তার প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা অনুভব করে। তার মতে "মানী মনে প্রেম জাগায়, শান্তি জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।" হঠাৎ রেল স্টেশনে দেখা হয়ে যায় মানীর সাথে। শুনতে পায় মানীর বাবা মারা দিয়েছেন। শান্তিকে মানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল বিপিন। মানী বিপিনকে শ্রাদ্ধে যেতে বলেই বিদায় নিল। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গিয়ে বিপিনের আবার পুরোতন প্রেম জেগে উঠল। মানী বিপিনকে বলে শান্তি তোমাকে ভালোবাসে। তার থেকে যেন বিপিন দূরে থাকে। মানীর কণ্ঠে, "মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও তোমাকে ভালোবাসে।" চলে আসার সময় বিপিন মানীকে কবে আর দেখা হবে জিজ্ঞাসিতেই মানী বলল, "আর জন্মে! এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্তব্য আছে, করে যাই বিপিনদা।" মনে এক অদ্ভুত অতৃপ্তি রেখে সে বিদায় নিয়ে শান্তির সাথে দেখা করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

ইতিবাচক দিক

সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এই উপন্যাসে লেখক ইংরেজ আমলের জমিদারি প্রথার কুফলকে তুলে ধরেছেন। নীলকরদের অত্যাচার, খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক কৈবর্ত্য একজন নার্সকে ধর্মান্তরিত করা, তখনকার হাতুড়ে চিকিৎসা, কুসংস্কার, জাত-পাতের বিভেদ, পরকীয়া প্রেম আর প্রেমের টানাপোড়েন সব কিছুই ছিল বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিপিন চরিত্রের মাধ্যমে লেখক গ্রামীণ সমাজের বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন। সত্য কথা বলতে লেখক কার্পণ্য করেননি।

"জমিদারি শাসন ছাড়াও পুরুষমানুষের জীবন আছে- রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষমানুষের কাজ।" বিপিন নিজেকে অনেকবার সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন।

নিবারণ মুখুজ্জে ও মনোরমার কাছে বীণা আর পটলের সম্পর্কের কথা জানার পর বিপিন নিজের কথা চিন্তা করল। তার আর মানীর সম্পর্কের কথা ভেবে আত্মসমালোচনা করে সে বীণাকে ডেকে মৃদু তিরস্কার করল কারণ সে নিজেও একই পথের পথিক আর বংশের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বীণাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। সেটি সক্রেটিসে দর্শন "নিজেকে জানো" - এই কথাটিকে প্রতিফলিত করে। বিপিনের সরল স্বীকারোক্তি "এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে

না- সবাই স্বার্থপর, যাহার যাহা ভালো লাগে সে তাহাই করে, অন্য কারো মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারাজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে-এখনও করিতেছে-অপরের দোষ দিয়া লাভ কী?

আইনদ্দির মুসলমান হলেও বিপিন তাকে খুব পছন্দ করে। ব্রাহ্মণ হয়েও সে আইনদ্দির বাড়িতে তামাক সেবন করে অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছে। বিপিনের মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। ফাঁসি তলার মাঠে নীলকরদের আমলে যে ফাঁসি দেওয়া হত তা আইনদ্দির মুখে লেখক প্রকাশ করেছেন। মানীর প্রতি বিপিনের কৃতজ্ঞতাবোধ। কারন মানী তাকে ডাক্তারী বিদ্যে রপ্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিল।

অসৎ পথের উপার্জন যে কাজে লাগে না বা চিরস্থায়ী হয় না সেটা লেখক বিনোদের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। বিনোদের মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি বিলীন হওয়া, নিজের ছেলের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, মেয়ের সম্বন্ধে কটু কথা রটে যাওয়া, পুত্রবধুর অনাহারে থাকা এই সবকিছুই কর্মফল । বই পড়াকে লেখক বিপিনের হাত ধরে উৎসাহিত করেছেন।বই পড়ে যে জীবন বদলানো যায় তাই তিনি প্রকাশ করেছেন। বিভূতিভূষণ নিজ হাতে যেন প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন। উপন্যাসের কানায় কানায় প্রকৃতিকে তিনি মিশিয়েছেন নিজের হাতে। বিপিনের কল্পনায় প্রকৃতি যেন মিশে আছে। প্রকৃতির মাঝে বিপিন যেন মানীকে খুঁজে পায়। সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মাস্টারির চাকরি ছেড়ে ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর ও নিচু জাতের মতি বাগদীর প্রেম এবং ঘটনাক্রমে মতির মৃত্যু এই উপন্যাসকে অনন্য করে তুলেছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের, ভাইয়ের প্রতি বোনের যে সুন্দর সম্পর্ক ও ভালোবাসা রয়েছে লেখক তা বিপিন, বলাই আর বীণা চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছেন। উপন্যাসের শেষের দিকে বিপিনের বাড়ি ফিরে যাওয়াকে লেখক রূপকার্থে ব্যবহৃত করেছেন। কারণ যতই কিছু বাইরে করেন না কেন, মনের শান্তি কিছু নিজের আবাসস্থল বা মাতৃভূমিতেই। সবাইকে দিনশেষে বাড়ি ফিরতে হবে।

তুলনামূলক আলোচনা

‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ এর সাথে ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসের সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ একটি সামাজিক উপন্যাস। এর প্রকাশকাল ১৯৪০। ইংরেজ সময়ের পটভূমিতে এ উপন্যাসে লেখক তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের একজন 'রাঁধুনী বামুন', হাজারি ঠাকুরের জীবনকথা সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসে ইংরেজ আমলের একজন বিপিন নামক ব্রাহ্মণের জীবনকথা বলা হয়েছে। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে হোটেলের বিক্রেতারা প্রায়শই প্রতারণা করত, বিশেষ করে হোটেলের ঝি পদ্ম অহরহ হোটেলের খাবার চুরি করত। হাজারি ঠাকুর এগুলোর বিপক্ষে হলেও কেবল রাঁধুনী হওয়ায় তার কিছু বলার অধিকার ছিল না । ফলে হাজারি ঠাকুর তাঁর নিজের হোটেল চালু করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। অপরদিকে বিপিন জমিদারের নায়েব হওয়া সত্ত্বেও জেলেদের উপর জুলুম করতে পারত না। পরবর্তীতে মানীর পরামর্শে ডাক্তারি বই পড়ে জনগণের সেবা করতে মনস্থির করল। লেখক বিপিনের মনের ভাষাকে সরল কথায় ব্যক্ত করেছেন যা পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবে না। “মানী ছাড়া

জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়।” বিপিন যতই খারাপ হোক মানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সে কার্পণ্য করেনি। নিজের কর্মফল যে নিজের সন্তান সন্তুতিদের ভোগ করতে সেই বিষয়টিও এড়িয়ে যান লেখক। “গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো না-ই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্মের প্রায়চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।” নারী চরিত্রের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন। মানী আর শান্তির প্রথম দেখায় মানীকে দেখে শান্তি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়। মানীও বুঝতে পারে শান্তি বিপিনকে ভালোবাসে। টাকা পয়সা দিয়ে যে কারো মন জয় করা কঠিন তা মানীর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। জামাইয়ের অঢেল টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও মানী বিপিনকে চিঠি দেয়।

তুলনামূলক সমালোচনা

এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মনোরমার প্রতি অবিচার করেছেন। মেয়েটি সারাজীবন সংসারের জন্য খেটে গেল কিন্তু এতটুকুও বিপিনের ভালোবাসা পেল না। সংসারকে আগলে রেখেও সে তার কোন প্রতিদান পায় নি। অভাব যখন থাকবে মিষ্টি কথাও কর্কশ মনে হয়। যে বিপিনের একটা মশারি কেনা টাকা নাই সে আবার পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়। কথায় আছে, অভাব যখন আসে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়। বিপিনের সরল স্বীকারোক্তি “মেয়েমানুষ সবাই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনে মনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগী কম নয়। স্বরূপ কি আর দুই-একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়।” বিপিনকে সংসারের কথা বলতে গিয়ে মনোরমাকে অনেক বকা খেতে হয়েছে।

বলাইকে হাসপাতালে না নিয়ে জল পড়া, ঝার ফুঁ ইত্যাদির মাধ্যমে বাঁচানোর চেষ্টা করা তখনকার গ্রামীণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। বিপিন চাইলেই তাকে রাণাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। হাতুড়ে ডাক্তারি করে রোগী বাঁচানো আর বিখ্যাত হয়ে যাওয়া বিপিনকে লেখক একটু বেশিই সুবিধা দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কপিলা কুবেরকে তার ভালোবাসার কথা যেভাবে প্রকাশ করেছে এখানে মানী বা শান্তি কিংবা বিপিন চাইলেও সেভাবে তাদের মনে কথাগুলো বলে ফেলতে পারত। কিন্তু তা না করে দুই নৌকায় পা দিয়ে বিপিন তার সংসার করে গেছেন। লেখক এতে পরকীয়া প্রেমকে একটু বেশিই প্রকাশিত করেছেন। বিপিনের কর্তব্যবোধ নাই বললেই চলে। কামিনীর সাথে বিপিনের বাবার যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তা জানা সত্ত্বেও বিপিন কামিনী পিসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যেটি খুব বেমানান মনে হয়েছে। এতে তার কোন প্রতিবাদ দেখা যায় নি। অথবা মায়ের প্রতি বিপিনের শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলে মনে হয় নি। নারীদের প্রতি বিপিনের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। “মেয়েরা

পারে- ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষ দশ মহাবিদ্যার মতো এক রূপ হইতে কটাক্ষে অন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।" "মেয়েমানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে! বাসি কাসুন্দি ঘাটা ওদের স্বভাব।" কামিনী বিপিনকে মানীর সাথে মিশার জন্য নিষেধ করার পরও বিপিন মনোরমার কথা না ভেবে মানীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসটি হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তবধর্মী একটি সামাজিক উপন্যাস। ব্রিটিশ ভারতের একটি বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতিনিধি বিপিনের জীবনের উত্থান পতনকে অবলম্বন করে রচিত এই উপন্যাসটি বর্তমান একবিংশ শতকে এসেও প্রাসঙ্গিক। তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে যা একজন সচেতন পাঠককে নতুন করে ভাবাতে বাধ্য করবে। মানব মনের নিগূঢ় সত্যকে সিদ্ধহস্তে উপস্থাপন করে বিভূতিভূষণ একজন মনোবিজ্ঞানীর মতো দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাই 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসটি একটি অবশ্য পাঠ্য বই হিসেবে সমাদৃত। জমিদারদের অত্যাচার, অবিচারের কথা মানীর কন্ঠে প্রমাণিত হয় –

"সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতির মুন্ডু খায়"